আলো পথ

এমএলই নিউজলেটার
ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৬

আদিবাসীদের শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার

৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল। সমাবেশে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ 'আদিবাসী' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি চেয়েছেন। তারা আদিবাসীদের শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকারের দাবি জানিয়েছেন। এবারের আদিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হল, 'আদিবাসীদের শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার'।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাশেদ খান মেনন বলেন, কেন আমরা আদিবাসী কথাটা স্বীকার করি না, আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এই অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে প্রশাসনের কাছে ভিন্ন বার্তা যাচ্ছে। আমি চাই আদিবাসী-বাঙালি এক হয়ে বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা। জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস। বিশেষ অতিথি ছিলেন আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডালিম চন্দ্র বর্মণ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী খুশী কবির, নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক রীনা রায়, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন প্রমুখ। গণসংগীত পরিবেশন করেন মাদল ও গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন ঘোষণাকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, সম্প্রতি কিছু আদিবাসী তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ নিলেও অধিকাংশ আদিবাসী তা পাচ্ছে না। বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠীকে মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, সরকার ও প্রশাসন আদিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে আন্তরিক নয়। তিনি বলেন, আমাদের সবাইকে নিজের প্রয়োজনেই সংগ্রামী হতে হবে, সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিরাও বক্তব্য দেন। সকলেই আদিবাসী মানুষের শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

সিলেটে আদিবাসীদের ভাষাচিত্র

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মণিপুরি, খাসি, পাত্র, গারো, হাজং, উরাং (ওঁরাও), মাল (মালো) এবং বিভিন্ন চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী। চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতিসত্তা রয়েছে। ভাষাভিত্তিক বিভাজনে অনেকে চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে ৬টি ভাষিক জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে থাকেন। এই ৬টি ভাষা হলো– উড়িয়া, ভূজপুরী (দেশোয়ালী), সাদরী, তেলেগু, সানতালী বা সান্তাল ও বাংলী (বাড়াইক, পরিমল সিং, চা-জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ২০০৯, ১৫-১৬)। সরকারিভাবে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে যে ৫টি ভাষাকে নির্বাচন করা হয়েছে এগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের কোনো ভাষা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারিভাবে না হলেও পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আদিবাসীদের ভাষাচর্চার নানারকম উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গেও এ ধরনের কিছু কিছু উদ্যোগ সাধারণভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু সিলেটে কোনো বেসরকারি সংস্থা এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেনি। তবে সিলেটের ভাষাগুলোর মধ্যে মণিপুরি, খাসি ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার ক্ষেত্রে নিজেদের উদ্যোগে সাহিত্য সংগঠন তৈরি করে লিখিতভাবে নিয়মিত সাহিত্যচর্চার এক সচেতন প্রয়াস লক্ষ করি। মণিপুরি ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। কিন্তু প্রায় দুই হাজার বৎসরের পুরানো এই লিপি একসময় নানা কারণে বাংলা বর্ণমালা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। সেই থেকে গত কয়েক শ' বছর যাবৎ মণিপুরি ভাষা বাংলা লিপিতে লিখিত হচ্ছে। তবে এই মূল মণিপুরি লিপি একেবারে হারিয়ে যায়নি। মণিপুর রাজ্যে, খুব সীমিত পরিসরে হলেও, অব্যাহত ছিল এর প্রচলন। ২০০৫ সালে মণিপুর রাজ্যে মণিপুরি লিপিতে রচিত পাঠ্যপুস্তক দিয়ে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু হয় এবং ইতোমধ্যে এই কার্যক্রম কলেজ পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। আগামীতে মণিপুরে মণিপুরি লিপি পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে এবং বাংলা লিপির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর সে কারণেই মণিপুরি ভাষার মূল স্রোতোধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন এক সম্পর্ক রাখার স্বার্থে বাংলাদেশেও 'মণিপুরি ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা' একান্তই নিজেদের উদ্যোগে নতুন প্রজন্মের মণিপুরি শিক্ষার্থীদের মণিপুরি লিপি ও ভাষা শেখানোর লক্ষ্যে মণিপুরি অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে ৭টি মণিপুরি স্কুল স্থাপন করেছে, যেখানে শুধু সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরে একটি বেসরকারি সংস্থা 'এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (একডো)' একটি দাতাসংস্থার সহায়তায় মণিপুরি লিপি ও ভাষা শিক্ষার ৩টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নিয়মিত পরিচালনা করছে। অন্যান্য ভাষা শুধু মৌখিক ভাষা হিসেবে প্রচলিত থাকায় প্রয়োজনীয় পরিচর্যার অভাবে দ্রুত হারিয়ে যেতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

এ. কে. শেরাম

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের শিশুবিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের (Integrated Community Development Project-ICDP) অধীনে মা ও শিশুর উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে পরবর্তী সময়ে যুক্ত হয়েছে শিশুবিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, যা দুই বছর মেয়াদি শিশুবান্ধব একটি শিক্ষাক্রমের আলোকে পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৪,০০০ পাড়াকেন্দ্রে ৬০,২২২ জন শিশু এতে অংশ নিচ্ছে।

শুরুতে পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম না থাকলেও ২০০১ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল-এর সমন্বিত উদ্যোগে শিশুবিকাশের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও ২০০৬-'০৭ সালে ইসিডিআরসি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহায়তায় শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। তারপর দীর্ঘদিন এই কার্যক্রমের আর কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন হয়নি। যদিও গত এক দশকে শিশুবিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশে অনেক পরিবর্তন এসেছে, Pre-school Operational Framework ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এর মধ্যে অন্যতম।

এ সকল পরিবর্তনের আলোকে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের শিশুবিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিমার্জনের লক্ষ্যে ইউনিসেফের অর্থায়নে এবং ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (ICHD)-এর কারিগরি সহায়তায় ২০১৫ সালে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগের অধীনে পাড়াকেন্দ্রের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের নির্দেশনা অনুসারে এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম (MtbMLE) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে পাড়াকর্মী সহায়িকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষাভিত্তিক উপকরণ, যেমন - ছড়া, গান, গল্প প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব উপকরণ সংগ্রহ ও সংকলনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত কর্মশালায় বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব লিপি নেই। যাদের রয়েছে তাদের মধ্যেও অধিকাংশ মানুষ নিজস্ব লিপিতে সাক্ষর নয়, তাই উপকরণ প্রণয়নের জন্য ২০১৩-'১৪ সাল থেকে পরিচালিত পাইলট প্রকল্পের ফলাফল ও মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উচ্চারণ অক্ষুণ্ন রেখে বাংলা লিপি ব্যবহার করে লেখা হয়েছে।

শিশুর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করতে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অভিভাবকদের শিশু লালনপালন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা বা উঠান বৈঠককে আরও ফলপ্রসূ করতে সাম্প্রতিকতম তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে এবং এ অঞ্চলের চাহিদাকে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। পাড়াকর্মীদের মাসিক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ও হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবহিত করতে ক্লাস্টার সভার কর্মসূচি ও সভা পরিচালনার ম্যানুয়াল যুক্ত করা হয়েছে। এসব জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পরিবর্তন ও সংযোজনকে মাথায় রেখে পাড়াকর্মী সহায়িকা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল নতুন করে সাজানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পরিমার্জিত কার্যক্রম ও উপকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করা হয়েছে।

ড. হ্যাপি দাশ

অবশেষে মাতৃভাষায় বই পাচ্ছে পাঁচ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা

নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে আগামী শিক্ষাবর্ষ (২০১৭) থেকে মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পাচ্ছে পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা। এই নৃগোষ্ঠীগুলো হলো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা (ককবরক), গারো ও ওঁরাও (সাদরি)। এই পাঁচ জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১০ লাখের বেশি। এর মধ্যে চাকমা ও মারমা ভাষার বইগুলো তাদের নিজস্ব লিপিতে লেখা। কিন্তু বাকি তিনটি নৃগোষ্ঠীর বই লেখা হচ্ছে কোনোটি বাংলা লিপিতে, কোনোটি রোমান হরফে। আগামী বছর শুধু প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় বই দেওয়া হবে। পরের বছর (২০১৮) প্রথম শ্রেণি ও এর পরের বছর দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বইও মাতৃভাষায় ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। তবে এরপর ধীরে ধীরে সবাইকে জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বই পড়তে হবে। জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার প্রথম আলোকে বলেন, 'এর জন্য আমরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। এটা হলে খুবই ভালো হবে। তবে শুধু বই হলেই মাতৃভাষায় শিক্ষা হয়ে যাবে এমনটা নয়। এখনো শিক্ষক প্রশিক্ষণ হয়নি। সেটা না হওয়া পর্যন্ত এটা বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে যাবে।' জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চার কর্মকর্তা *প্রথম আলো*-কে এই তথ্য জানান। তাঁরা বলেন, ইতোমধ্যে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়েছে। এখন চাহিদা অনুযায়ী বই ছাপানো হবে। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, নিজস্ব সংস্কৃতির চিত্রসহ আনুষঙ্গিক বিষয় দিয়ে বইগুলো সাজানো হয়েছে। এনসিটিবি'র একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*-কে বলেন, চাকমা ভাষার বই চিত্রিত করার কাজে যুক্ত ছিলেন শিল্পী কনকচাঁপা চাকমা। মারমা ভাষার বই লেখার কাজ সমন্বয় ও সম্পাদনা কমিটির প্রধান খাগড়াছড়ির মহালছড়ির পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল কর্মকর্তা অংক্যজাই মারমা। জানতে চাইলে অংক্যজাই মারমা মুঠোফোনে *প্রথম আলো*-কে বলেন, কাজটি বেশ কঠিন। প্রায় দেড় বছর কাজ করার পর গত ৯ মে বইটি এনসিটিবিতে দাখিল করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিকের জন্য জাতীয়ভাবে প্রণীত বইয়ের আদলেই এসব বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়েছে। তবে বর্ণভিত্তিক পরিচয়গুলো দেওয়া হয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতির মাধ্যমে।

এমএলই শিখন-শেখানো সামগ্রী চূড়ান্তকরণ কর্মশালা

এনসিটিবি'র একাধিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ বলেন, শিশুকে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া জরুরি। এরপর সে ধীরে ধীরে মাতৃভাষার সঙ্গে অন্য ভাষায় (বাংলাদেশের জন্য বাংলা) শিক্ষা নেবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সময় সাত বছর। এই সময়টাকে বলে 'ব্রিজিং পিরিয়ড'। জাতীয় শিক্ষানীতিতেও শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষানীতির আলোকে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি এই পাঁচটি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে। কিন্তু এত দিনেও তা চূড়ান্ত করতে পারেনি।

এনসিটিবি'র একজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ *প্রথম আলো*-কে বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যখন শিক্ষানীতি অনুমোদিত হয়, তখন শিক্ষাক্রম সংশোধনের কাজ শুরু হয়ে যায়। এ জন্য তখন সিদ্ধান্ত হয়, শিক্ষাক্রম সংশোধন হয়ে গেলে সে অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় বই দেওয়া হবে। কিন্তু শিক্ষাক্রম তৈরির পর এ ধরনের বই লেখার মতো ভালো লেখক পাওয়া যাচ্ছিল না। তাছাড়া লিপি একটা বড় সংকট হয়ে দেখা দেয়। চাকমা ও মারমাদের মৌখিক ও লিখিত উভয় রূপ থাকলেও ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি নৃগোষ্ঠীর ভাষার নিজস্ব লিপি নেই। কোন লিপিতে তাদের ভাষার পাঠ্যবই লেখা হবে, এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বেশ সময় লেগে যায়। এই বিশেষজ্ঞ বলেন, দেশে ৩৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থাকলেও বেশির ভাগেরই নিজস্ব লিপি নেই। সাঁওতালদের নিজস্ব লিপি না থাকায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন লিপি গ্রহণ করা হবে, এ নিয়ে দ্বিধাবিভক্তি দেখা দেয়। একটি পক্ষ বাংলা লিপি গ্রহণের পক্ষপাতী হলেও আরেকটি পক্ষ রোমান হরফ নেওয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। এ বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় সাঁওতাল ভাষার পাঠ্যপুস্তক এবার বের করা সম্ভব হচ্ছে না। এনসিটিবি সূত্র জানায়, আটটি বিষয় নিয়ে মাতৃভাষায় বই প্রণয়ন করার কাজ শুরু হয়েছে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে ৯৫ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। এখন শুধু ছাপার কাজ বাকি। এই কাজে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইউনিসেফ। এনসিটিবি'র সদস্য রতন সিদ্দিকী *প্রথম আলো*-কে বলেন, ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে শিক্ষার্থী ও বইয়ের চাহিদা দিতে বলেছে এনসিটিবি। এই তালিকা পাওয়ার পর বই ছাপানোর কাজ শুরু হবে। জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থী ও বইয়ের সংখ্যার চাহিদা শিগগিরই প্রদান করা হবে।

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহিমা চিরভাস্বর হয়ে আছে।

১৯৯৭ সালে একুশের এক অনুষ্ঠানে **গফরগাঁও থিয়েটার** নামক একটি সংগঠন একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতির প্রথম দাবি তুলেছিল। এছাড়া ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় তৎকালীন পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী ম. ইনামুল হকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি দাবি করেন, ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দানের আহ্বান জানিয়ে তিনি একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এই চিঠি প্রকাশিত হবার আগে ১৯৯৯ সালের ২২ নভেম্বর তিনি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক পত্রে এ সম্পর্কিত একটি দলিলও প্রেরণ করেন।

কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষাপ্রেমিক গোষ্ঠী কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়। সেই প্রস্তাবে মাতৃভাষাপ্রেমিক গোষ্ঠীর সাত জাতির সাত ভাষার দশজন সদস্য স্বাক্ষর করেছিলেন। তারা হলেন বাংলার রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম। এছাড়া ফিলিপিনো ভাষার দু'জন, ইংরেজির দু'জন এবং ক্যান্টনিজ, কাচি, জার্মান, হিন্দি ভাষার একজন করে স্বাক্ষর করেন। সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের দপ্তর থেকে ইউনেস্কোর সদর দপ্তর, প্যারিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়। পরবর্তীকালে রফিকুল ইসলাম ইউনেস্কোর সদর দপ্তরের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের আন্না মারিয়া মেজলোক ৩ মার্চ ১৯৯৯ সালে রফিকুল ইসলামকে একটি চিঠি লেখেন। একই বছরের ৮ এপ্রিল আন্না মারিয়া আবার তাকে চিঠি লেখেন যে, বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। তাই ইউনেস্কো পরিচালনা বোর্ডের কোনো সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে সেটি উত্থাপিত হতে হবে। তিনি রফিকুল ইসলামকে ইউনেস্কোর পরিচালনা বোর্ডের কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের ঠিকানাও প্রেরণ করেন। কারণ, ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদে বিষয়টি আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হলে কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করার বিধান রয়েছে। রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বের সাথে অতি দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নোট প্রেরণ করে। মাত্র দুইদিনে সব রকম আমলাতান্ত্রিক বিধিমালা এড়িয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক নথি অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছাড়াই সরাসরি ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দেন। ১৯৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশন ও ৩০ তম সাধারণ সম্মেলন ছিল। এ সম্মেলনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এ বিষয়ে একটি সমস্যা দেখা দেয়। সেটি হল দিবসটি 'mother language day' নাকি 'mother tongue day' হবে, সেই সাথে বাজেটের বিষয়টিও জড়িত ছিল। এসব জটিলতার জন্য সিদ্ধান্ত হয় বিষয়টি পরবর্তীকালে ১৬০তম অধিবেশনে উত্থাপন করা হবে। অবশেষে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর বিশ্বের দরবারে আরেক ইতিহাস রচিত হল। সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় একুশে ফেব্রুয়ারি'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির আনন্দ ও গৌরবকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ উপলক্ষে ১৯৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণা করার জন্য বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। সেই ঘোষণা মোতাবেক ২০০১ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এভাবেই ২০১০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আনুষ্ঠানিক যাত্রার অল্প সময়ের মধ্যে ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। আশা করি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রশ্নে ভূমিকা রাখবে।

পুলক চাকমা

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৬-এর দাবিনামা

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের দাবি-

- আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। আদিবাসীদের শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। শিক্ষানীতির সুফল যাতে আদিবাসীরা ভোগ করতে পারে, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে অবিলম্বে আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
- আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত ভূমি অধিকার কার্যকর করতে হবে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে সময়সূচিভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে; ভূমি কমিশন আইন অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০০৭ সালে গৃহীত আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র অনুসমর্থন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আইএলও কনভেনশন ১০৭ বাস্তবায়ন ও ১৬৯ নং কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করতে হবে।
- সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য অবিলম্বে ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে। মধুপুর গড়ে গারো ও কোচদের ভূমিতে ঘোষিত রিজার্ভ ফরেস্ট বাতিল করতে হবে।
- আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস কর্তৃক প্রণীত আদিবাসী অধিকার আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- মৌলভীবাজার জেলার ঝিমাই, পাল্লাতল ও নাহার খাসিয়াপুঞ্জির খাসিয়াদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের উপর প্রশাসনিক ও অবৈধ চাপ প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে এবং চা বাগানের লীজ বাতিল করতে হবে।
- আদিবাসীদের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, মিথ্যা মামলা, হয়রানি, নির্যাতন ও অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে। আদিবাসী নারীসহ সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- জাতিসংঘ ঘোষিত ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করতে হবে।
- সংবিধান সংশোধন করে আদিবাসীদের আত্ম-পরিচয় ও অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

এমএলই ফোরাম-এর বিশেষ সভা

২২ আগস্ট, ২০১৬ তারিখ বিকাল ৩:৩০ মিনিটে এমএলই ফোরাম-এর সদস্যবৃন্দ ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর সঙ্গে এক বিশেষ সভায় মিলিত হন। এ সভায় আলোচনায় অংশ নেন ইন্দুভূষণ দেব, উপ-পরিচালক, মোঃ মজিবুর রহমান, শিক্ষা অফিসার, মোঃ ফিরোজ কবির, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এমএলই ফোরামের পক্ষ থেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ম. হাবিবুর রহমান, সেভ দ্য চিলড্রেন, তপন কুমার দাশ, গণসাক্ষরতা অভিযান, মোঃ গোলাম মোস্তফা দুলাল, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, আলবার্ট মানকিন, সিপ্রাড, মেহেরুন্নাহার স্বপ্না, সেভ দ্য চিলড্রেন, রবীন্দ্রনাথ সরেন, জেএপি এবং মেহেদী হাসান, গণসাক্ষরতা অভিযান।

সভায় আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কাজের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে এ কাজের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ বিশেষ করে আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং মাতৃভাষায় প্রথম শ্রেণির উপকরণ তৈরির কাজ শুরু করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

এসব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ড. আবু হেনা আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার অধিকার অর্জনে বাঙালি জাতি আন্দোলন করেছে। বুকের রক্ত ঢেলে বাঙালি প্রতিষ্ঠা করেছে মাতৃভাষায় কথা বলা ও লেখাপড়ার অধিকার। এদেশেই আদিবাসীরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে তা আমাদের কাম্য হতে পারে না।

একই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ওয়ার্কার্স ফোরামের নেতা ও আদিবাসী প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ সরেন ও এনজিও প্রতিনিধি আলবার্ট মানকিন বলেন, আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বদ্ধপরিকর। তথাপি দাপ্তরিক উদ্যোগ গ্রহণে অযথা সময়ক্ষেপণ হচ্ছে। বিলম্বিত হচ্ছে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার কাজ। তাঁরা দু'জনেই এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের কাছে অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে সাঁওতাল কমিউনিটির জন্য বাংলা ও রোমান উভয় ভাষাতেই শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়ার জন্যও তারা অনুরোধ করেন।

ড. আবু হেনা উপর্যুক্ত বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

মেহেদী হাসান

মণিপুরি ভাষা

রাজার বাগানহান

মণিপুরর রাজ্যৎ রাজা আগরতা ডাঙর ফুলর বাগানআহান আছিল। অহাৎ স্বর্গর পারিজাত ফুলেৎত অকরিয়া হাবি জাতর ফুল আছিল। কতোদিন ইল রাজার মনহান জবর নুঙেই নাইছে। কারণহান বাগানঅহাৎ আগর অসারে ফুল না শাতর। পৌএহান সিতারলে রাজ্যর মানুয়ে হায় হায় করানি অকরলা।

কাদার রাজ্যর রাজার পিতক আগ পরে জবর নুঙেইনানি ইয়া আছিল। আকদিন লেইরাপা মানুগ পারা ইয়া নিকুলিয়া আহিতে আহিতে রাজার লেইফামে আহিয়া ফৌয়িলগা। তারে রাজা এগই আংকরল, পাহারাদেনা পারতইতা না কিতা। পারলে রাজ্যহার আধাহান তারে দিয়াদিতই। তা পাহারার কামহান লাক্করল। পাহারাৎ গিয়া দেখের, রাতি বারোটার পিছেৎত বাগানহান বুজিয়া ফুল শাতোনি অকরল। কী আচানকহান, হাদিৎ বয়া ঘুমশৌ আহান দিয়া উঠিয়া চারথাং, হাবি উদুম দুয়া, আকগৌ ফুল নেইছে।

বিয়ানে রাজাই আংকরলে তা মাতলো, রাজামশাই, আক্গো দুক্গ ফুল দেখলু থাংতে বিয়ানহান ফুইতে নেইল। কালি বিয়ান পেয়া ফুল থৌয়ানি পারতৌ, দিন আহান সময় দে। হৌদিনকার সময়হান ইলতাই তেন্নাম ফুল শাতোনি অকরল।

রাতি নমিলগা অহাৎ স্বর্গীয় সরারেল রাজার হাতগো জিলক আহিয়া লামলাগা। নিঙল এগি হিং দারিয়া ফুল ছিরানি অকরলা। তারতা আহিগি তাহাক-মাহাক! ফুল ছিরিয়া আগ আগ যানা অকরলে তা তাপ্প কাদাহাৎ চেপইলগা। খুলি অগই তম্পুলগ করে ছিরিরি থাংতে খানি তাপুইলি। ফুরদিয়া যাংগা বুলতেই রাজার পিতকে ইনাফিহার চুটিগ থক্ক ধরে বেল্ল।

: হৈমা হৈমা, কিহান করলেতা, মোরে এরাদে, মি ডিলুইলু, বরগ নাপাত পরলু, এরাদে।

: এরাদিতৌ, তোর পরিচয়হান কিহান?

: মি স্বর্গর সরারেল রাজার খুলি জিলকগ। স্বর্গর হাবিৎত হবা রাজার পিতক আগরে আমি হাত বেইবুনি নিক্কা ফুলদান দেরাংতা। হাবিৎত হবা করে যেগই ফুলদান দিয়া পারতই অগরে তা লহঙ করতই। অহাননো আমি এহাৎত ফুল ছির'রাংতা। মোরে এরাদে।

: এরাদিতৌ তার আগে বাগানহান বুজ্জে ফুল শাতকরেদিয়া যাগা। তেই তাপ্প শপাহানি সকানিয়ে ফুল শাতুয়া ঝরক ঝরক করানি অকরল।

বিয়ানফুল ফুইল। বাগানহাৎ ফুল শাতুইছে পৌ এহান রাজারাং ফৌয়িলগা। দাপ্দে দাপ্দে মহরানীয়ে কিতাই আহিয়া চেইলাগা। অদিনেৎত রাজার বাগানে হাদ্দিন ফুল শাতোনি অকরল। সরালেলর জিলকে অদিন ফুলদান দিয়া নুয়ারল। তেইরাংত মানুর গৎ আহের বুলিয়া তেইরে দুরেই করলা। জুরন দিয়া কাদিরি। উদাহিচি জীবন আহান তেইরতা আরম্ভ ইল।

পুরস্কারহাননো পাহারাদারগ নিজর রাজ্যৎ আলুয়া গেলগা। আকদিনতে পাহুরিয়া রাজার পিতকে বাঁশিগ মনগর তলে থয়া বুলাত গেলগা। মিনকে অগ পেয়া ফুদা আহান দিতেই স্বর্গৎত তেই তুরাকো লামিয়া আহিলি। আহিয়া রাজপুত্রর মিনকরে দেখল। কান্তিহানে থাপর আহান দিয়া তেইরে বেলিয়া গেলিগা।

রাজার পিতকে বুলাৎত আহিয়া চারথাং বিপরীত কা- আহান ইয়া আছে। কাদাহাৎ বাঁশিঅগ পড়িয়া আছে। তা হাবিতা নিংশিঙ ইল। রুহা আহান দিতেই তেই আহিলি। তিকসৌয়িয়া মাতিরি, কিদিয়া তোর মিনকে অগ রুহাছিলিতা? তা নিজর ভুল স্বীকার করল আরো তেই থক্ক আতহাননো সকিয়া মিনকরে জিংতা করেয়িলো। সরালেলর জিলক স্বর্গৎ গেলিগা। তাঙর জিনাহান নুঙেই আয়া থাইলা।

বাংলা ভাষা

রাজার বাগানখানি

মণিপুর রাজ্যের এক রাজার বড় একটি ফুলের বাগান ছিল। স্বর্গের পারিজাত থেকে শুরু করে সব ধরনের ফুলই ফুটত বাগানে।

কয়েকদিন ধরে রাজার মন ভালো নেই। কারণ, বাগানে আগের মতো ফুল ফোটে না। খবরটি ছড়িয়ে পড়লে রাজ্যের মানুষ হায় হায় করতে থাকে।

সেই সময় প্রতিবেশী রাজ্যের এক রাজপুত্র বড়ো মানসিক অশান্তিতে ছিল। তাই একদিন রাজ্য ছেড়ে দরিদ্র বেশে ঘুরতে ঘুরতে এই রাজ্যে এসে পৌছায়। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল বাগান পাহারা দিতে পারবে কিনা। পারলে তাকে রাজ্যের অর্ধেক দেওয়া হবে। সে কাজটি গ্রহণ করল। পাহারা দিতে গিয়ে দেখে, রাত বারোটার পর থেকে বাগানে ফুল ফুটতে শুরু করেছে। অথচ একটু ঘুমানোর পর উঠে দেখে, বাগান শূন্য, একটি ফুলও নেই।

সকালবেলা রাজা জিজ্ঞেস করলে সে বলে, রাজামশাই, রাতে ফুল ফুটতে দেখেছিলাম, কিন্তু সকালবেলায় দেখি একটিও নেই। আমাকে একটা দিন সময় দিন, কাল সকাল পর্যন্ত ফুল ফুটিয়ে রাখতে পারব।

আগের রাতের মতো একই সময়ে আবারও ফুল ফুটতে শুরু করে। শেষ রাতের দিকে স্বর্গের রাজা সরালেলের সাতটি মেয়ে বাগানে এসে নামে। মেয়েরা পাল্লা দিয়ে ফুল ছিঁড়তে থাকে। রাজপুত্রের চোখে বিস্ময়! ফুল ছিঁড়তে গিয়ে সবচেয়ে ছোট মেয়েটির দেরি হয়। উড়ে যাবে, এমন সময় রাজকুমার তার ওড়নার একপ্রান্ত ধরে টান দেয়। মেয়েটি বলে, হায় হায়! একি করলে! আমাকে ছেড়ে দাও, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি আর বর পাব না, ছেড়ে দাও।

রাজপুত্র বলে, কিন্তু তুমি কে? মেয়েটি বলে, আমি স্বর্গের রাজা সরালেলের ছোট মেয়ে। স্বর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার এক ছেলেকে আমরা সাত বোন প্রতিদিন ফুলের মালা উপহার দিই। যে সবচেয়ে সুন্দর মালাটি দিতে পারবে, রাজকুমার তাকেই বিয়ে করবে। তাই আমরা এখান থেকে ফুল ছিঁড়ি। আমাকে ছেড়ে দাও।

রাজকুমার বলে, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করলে কী করব? মেয়েটি একটি জাদুর বাঁশি দিয়ে বলে, এটিতে ফুঁ দিলে আমি চলে আসব। তারপর মেয়েটি চলে গেল।

সরালেলের মেয়ে সেদিন স্বর্গের রাজার ছেলেকে ফুলের মালা দিতে পারল না। গা থেকে মানুষের গন্ধ আসে বলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এক বিপর্যস্ত জীবন আরম্ভ হল তার।

পুরস্কার নিয়ে বাগান পাহারাদার রাজপুত্র নিজের রাজ্যে ফিরে আসে। একদিন ভুল করে বাঁশিটি বালিশের নিচে রেখে সে ঘুরতে বের হলো। তার বউ বাঁশিটি পেয়ে ফুঁ দিতেই তৎক্ষণাৎ স্বর্গ থেকে মেয়েটি নেমে আসে। এসেই রাজপুত্রের বউকে দেখতে পায়। মেয়েটি রেগে এক চড় মেরে তাকে অজ্ঞান করে দিয়ে চলে যায়।

রাজকুমার ফিরে এসে এই কাণ্ড দেখে। বাঁশিটি পড়ে থাকতে দেখে ওর সব মনে পড়ে। তখন বাঁশি বাজাতেই মেয়েটি হাজির। সে রেগে বলে, তোমার বউ কেন এটা বাজাল? রাজকুমার তার দোষ স্বীকার করল। তখন মেয়েটি রাজপুত্রের বউকে স্পর্শ করলে সে বেঁচে ওঠে। সরালেলের মেয়ে আবার স্বর্গে ফিরে যায়। অতঃপর রাজপুত্র ও তার বউ সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকে।

আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধা
সন্ধ্যারাণী সাংমা

গারো নারী মুক্তিযোদ্ধা সন্ধ্যারাণী সাংমা ১৯৫৫ সালে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার জানজালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক নাম সন্ধ্যারাণী। ১৯৭১ সালে তিনি নার্সিং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের জয়রামকুড়া খ্রিস্টান মিশনারি হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে তিনি ভর্তি হন। সেই হাসপাতালে চিকিৎসক ছিলেন ডা. প্রেমাঙ্কুর রায়ের বড় ভাই। সন্ধ্যারাণীর ট্রেনিং অবস্থায় শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতে অসহযোগের খবর পান। পাকিস্তানি বাহিনী ময়মনসিংহ হয়ে হালুয়াঘাটের দিকে এগুতে শুরু করলে তিনি এবং তাঁর খালাতো বোন ভেরোনিকা সিমসাং পশ্চিম বারোমারি খ্রিস্টান মিশনে চলে যান। সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করার পর শেরপুরের ঝিনাইগাতী থানার মরিয়মনগর খ্রিস্টান মিশনে চলে যান। দুই সপ্তাহ পর সেখানেও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। তাই ভগ্নিপতির সহায়তায় তিনি এবং তাঁর বোন দেশ ছেড়ে ভারতীয় সীমান্তের উদ্দেশে রওনা হন। সঙ্গে ছিল প্রায় হাজার মানুষের এক বিরাট দল। রাত তিনটার পর তাঁরা পায়ে হেঁটে ভারতের মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জ গিয়ে শরণার্থী শিবিরে ওঠেন। সেখানে সুযোগ আসে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি কাজ করার।

মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ডা. প্রেমাঙ্কুর রায় ও ক্যাপ্টেন আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে চালু করা হয় ৪৫ শয্যার অস্থায়ী ১১ নম্বর সেক্টর ফিল্ড হাসপাতাল। পরে ডা. প্রেমাঙ্কুর রায় তাঁর অবস্থান জানতে পেরে দেখা করে বলেন, 'সন্ধ্যা, তুমি তো নার্সিং প্রশিক্ষণ করেছ, তুমি আমাদের সাথে হাসপাতালে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করো।' তার কথায় সন্ধ্যারাণী রাজি হয়ে যান। তিনি ও খালাতো বোন ভেরোনিকা এবং আরো দুইজন পুরুষ নার্সসহ অনেকে অস্থায়ী হাসপাতালে মেডিকেল ও সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আহত ও রোগাক্রান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দিনরাত সেবা দিয়েছেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রোপচারে কাজ করেছেন, সেবা দিয়ে তাদের সুস্থ করে তুলেন। টাইফয়েড, কলেরা, ডায়রিয়া ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীদেরও সেবা দেন। কিন্তু তখন পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ছিল না। তাঁরা ছুরি, কাঁথা সেলাইয়ের সুতা ব্যবহার করেন। দাড়ি কাটার কাঁচি বাঁকিয়ে ফরসেপের কাজ চালিয়েছেন। যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হতো ফোটানো পানি দিয়ে। হাসপাতালের বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি ও বাতাস ঢুকে সমস্যায় ফেলে দিতো। চিকিৎসার কাজে রাতেও একমাত্র ভরসা ছিল হারিকেন বা টর্চলাইট। ডিসেম্বরের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধারা দেশে প্রবেশ করতে শুরু করেন। তাঁরা ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল নিয়ে দেশে প্রবেশ করেন। প্রথমেই জামালপুরের বকশিগঞ্জ থানাকে শত্রুমুক্ত করা হয়। তাঁদের সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। আক্রমণে পর্যুদস্ত পাকিস্তানি বাহিনী শেরপুর ও জামালপুরের দিকে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তাঁরা তখন জামালপুরে হাসপাতাল চালু করে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দেয়। মনে আছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বকশিগঞ্জ ক্যাম্পের অবস্থান লক্ষ্য করে পাকিস্তানি বাহিনী মর্টার শেল নিক্ষেপ করে। তবে শেলটি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অন্যত্র বিস্ফোরিত হয়।

শফিউদ্দিন তালুকদার
সূত্র : সুন্দরম, ১৬ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত 'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর সহায়তায় 'অঙ্গীকার' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯; ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-২; ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd

European Union